সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ ৪৮, সংখ্যা : ৩ ॥ আষাঢ় ১৪১৮ ॥ জুন ২০১১

চাকমা লোকসাহিত্যে বাংলা ভাষার প্রভাব

জেনিফার জাহান*

লোকসাহিত্য মূলত লোকমানবের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিশীলতার নান্দনিক প্রকাশরূপ। বাংলাদেশ ভূখণ্ডের বৃহত্তর নৃগোষ্ঠী বাঙালিদের যেমন সমৃদ্ধ লোক-ঐতিহ্য রয়েছে তেমনি দেশের অন্যান্য আদিবাসী নৃগোষ্ঠীরও নিজস্ব লোকসংস্কৃতি বিদ্যমান। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী অন্যতম বৃহৎ নৃগোষ্ঠীর নাম 'চাকমা'[১]। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ জাতিসত্তা সংখ্যাগরিষ্ঠ। লোকসাহিত্যে চাকমা নৃগোষ্ঠী অত্যন্ত ঋদ্ধ, তাদের রয়েছে নিজস্ব সাহিত্যিক ঐতিহ্য ও সম্পদ। চাকমা লোকসাহিত্যের ভাষাবিষয়ক বিশ্লেষণে লক্ষণীয় যে, এতে প্রচুর বাংলা উৎসজাত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণভাবে, ধ্বনিগত এবং রূপতাত্ত্বিক কিছু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলা প্রমিত ও ঔপভাষিক শব্দ চাকমা লোকভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ কারণে এরূপ অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয় যে, চাকমা লোকসাহিত্যে বাংলা ভাষার তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। কোনো ভাষার লোকসাহিত্যের ভাষাগত দিকসমূহ বিবেচনার জন্য লোকভাষাবিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আধুনিককালে লোকভাষাবিজ্ঞান লোকমানবের ভাষা ব্যবহারের বিবিধ সূক্ষ্ম দিকের প্রতি আলোকপাত করে এবং তাদের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়। এই তাত্ত্বিক বিবেচনাকে অনুসরণ করে বর্তমান প্রবন্ধে চাকমা লোকসাহিত্যে ব্যবহৃত বাংলা শব্দগুলো উপস্থাপন করে তাদের লোকভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হবে। এই লক্ষ্যে প্রবন্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে চাকমা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও লোকভাষাবৈজ্ঞানিক তত্ত্বকাঠামো উপস্থাপন করা হবে। উল্লিখিত আলোচনা অংশের প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসারে চাকমা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন অনুষঙ্গে বাংলা শব্দের ব্যবহার কীরূপ তা ভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিরূপণের চেষ্টা করা হবে।

১. চাকমা ভাষা

চাকমাদের স্বতন্ত্র ভাষা 'চাঙমা' বা 'চাকমা'। ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, পূর্বে চাকমা জাতি তিব্বতি-বর্মী পরিবারের 'আরাকান' ভাষায় কথা বলত এবং চাকমাদের নিজস্ব যে বর্ণলিপি আছে তাতে আরাকানি বর্ণের প্রাধান্য বেশি। এছাড়াও জিহ্বামূল থেকে উচ্চারিত চাকমা ধ্বনিগুলোর সাথে চীনা ভাষার সাদৃশ্য পাওয়া যায়, যা একটি সুরপ্রধান (tonal) ভাষা, অর্থাৎ সুরের (tone) পার্থক্যে আর্থপরিবর্তন ঘটে থাকে। এ সাদৃশ্যের ফলে ধ্বনিগত বিচারে চাকমা ভাষাকে চীনা-তিব্বতি ভাষা পরিবারভুক্ত বলে বিভিন্ন সূত্রে চিহ্নিত করা হয়েছে (ethnologue/Indo-European family/Chakma)। স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন চাকমাকে 'Broken Dialect of Bengali' বলে অভিহিত করে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রাচ্য শাখার দক্ষিণ-পূর্ব উপশাখার অন্তর্ভুক্ত করেছেন

---

* প্রভাষক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(Grierson; 1903 : 321)। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চাকমা ভাষাকে বাংলার উপভাষা (dialect) বলে অভিহিতি করেন (শহীদুল্লাহ; ১৯৯৩)। কিন্তু চাকমা ভাষার স্বতন্ত্র উচ্চারণ বৈচিত্র্য ও সুরপ্রাধান্য বিচার করে এবং পালি ও অহমিয়া ভাষার সাথে এর সাদৃশ্য পর্যবেক্ষণ করে এ ভাষাকে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাষা বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

চাকমাদের নিজস্ব যে লিপি আছে তা থাইল্যান্ডের খমের (Khmer) এবং বার্মিজ লিপির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন বলেছেন '... is almost identical with the khmer character, which was formerly in use in Cambodia, Laos, ... and at least the southern parts of Burma' (১৯০৩ : ৩২১)। চাকমা বর্ণমালাগুলো জিহ্বার অন্তর্ভাগ (bottom) থেকে উচ্চারিত এবং কোমল ধ্বনিরূপে (soft sound) প্রকাশিত হয়। তবে লোকগাথা, প্রবাদ প্রবচন (idioms) ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলা ভাষার সাথে চাকমা ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে। চাকমা কবি শিবচরণ রচিত *গজেল লামা* (১৭৭৭) বইটির ভাষা প্রায় বাংলার মতোই। এমনকি এর স্বাগত সংগীতটিও পূর্ববঙ্গ গীতিকার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বর্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচ্য চাকমা লোকসাহিত্য বিশ্লেষণের পূর্বে লোকভাষা ও লোকভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে তাত্ত্বিক ধারণা অর্জন আবশ্যক।

২. লোকভাষা

লোকভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূলে রয়েছে 'লোক' (folk) অভিধাটির তাৎপর্যপূর্ণ উপস্থিতি। ইংরেজি 'Folk' শব্দটি এসেছে প্রাচীন ইংরেজি 'folc' থেকে যা সাধারণ জনমানুষ, গোষ্ঠী অথবা তাদের সংখ্যাধিক্য বোঝায়। 'Webster's Revised Unabridged Dictionary'-তে বলা হয়েছে : 'The people of a group township or villages; a community; a tribe.' পূর্বে পশ্চিমা দেশগুলোতে গেঁয়ো বা গ্রাম্য অর্থাৎ মার্জিত নয় এমন জনগোষ্ঠীকে বোঝাতে 'folk' শব্দটি ব্যবহৃত হতো। কিন্তু এই ধারণা বর্তমানে ভিন্নতা লাভ করেছে; বলা হচ্ছে, 'শহরেও অশিক্ষিত শ্রমজীবী মানুষ আছে, তারা গ্রাম থেকে শহরে ভিড় জমায়, তারা পূর্বের ও নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে লোককলার জন্ম দেয় ও চর্চা করে' (ওয়াকিল আহমদ; ১৯৯৭ : ৭)। এই যুক্তি থেকে লোক শব্দটির সংজ্ঞার্থ পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পুনর্গঠিত রূপে লোক ধারণাটি ব্যাখ্যা করলে তা সেই জনগোষ্ঠীকে নির্দেশ করে, যাদের ভাষা, বিশ্বাস, আচরণ, কর্মকাণ্ড ও জীবনপ্রবাহ অকৃত্রিমভাবে তাদের সংস্কৃতির বাহক। এসকল উপাদানের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য লোকায়ত জনগোষ্ঠীর ভাষা। প্রসঙ্গত, লোকভাষার সংজ্ঞার্থ নির্ধারণ করে বলা যায় যে, লোকভাষা হলো একটি 'বিশেষ ভাষিক কাঠামো, যা ব্যবহার করে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক গণ্ডির লোকায়ত মানবগোষ্ঠী পরস্পরের মধ্যে সংজ্ঞাপন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করে; যা কোনো নির্দিষ্ট আঞ্চলিক উপভাষা নয় বরং বিভিন্ন উপভাষার প্রভাবপুষ্ট একটি অ-মান্য (non-standard) সর্বজনগ্রাহ্য প্রতিদিনের অভিব্যক্তির ভাষা' (রহমান; ২০০৭)। লোকভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা যায় দৈনন্দিন সংজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার পাশপাশি এটি

লোককলা, লোকগাথা, লোকশাস্ত্র, লোকসংগীত বা লোকনৃত্যের অনুষঙ্গে যৌগিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে; আর লোককলার অন্যতম ঋদ্ধ সম্পদ লোকসাহিত্য।

৩. লোকভাষাবিজ্ঞান

লোকভাষাবিজ্ঞান বা 'Folk linguistics' কথাটির মূলে রয়েছে লোকভাষা ও এর ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-সামর্থ্য। ভিন্নমতে একে 'লৌকিক ভাষাতত্ত্ব' (সরকার, ১৯৯১: ১৪৩) বলেও চিহ্নিত করা হয়েছে। লোকভাষাবিজ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করে বলা হয়েছে 'belief about language (Hoenigswald,1971); অর্থাৎ, ভাষা সম্বন্ধে লোক সাধারণের বিশ্বাসই এর মূল বিষয়। এই মত অনুসারে মনে করা হয়, ভাষার বৈজ্ঞানিক ধারণার পূর্বে ভাষা সংক্রান্ত যে সব বিশ্বাস সাধারণ লোক তাদের চেতনায় ধারণ করে এসেছে তা নিয়েই এর আবর্তন। এক কথায় বলা যায়, 'গ্রামের লোকের পুরনো সংস্কার আক্রান্ত বিশ্বাস এবং শহুরে জনতার যুক্তিসম্মত ভাবনা চিন্তার সমন্বিত রূপ লৌকিক ভাষাতত্ত্ব' (সরকার; ১৯৯১ : ১৪৪)। তবে, আধুনিককালে লোকভাষাবিজ্ঞান লোককলার সব প্রপঞ্চই বিচার বিশ্লেষণ করে থাকে। ফলে, লোকসাহিত্যের বিশ্লেষণ লোকভাষাবৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার সীমাভুক্ত। পূর্বে মনে করা হতো, লোকভাষাবিজ্ঞানের বিশ্লেষিত ধারণাগুলো যুক্তিতথ্য দিয়ে যাচাইকৃত নয় বলে ভাষাবিজ্ঞানের সাথে এর মৌলিক পার্থক্য থেকেই যায়। কিন্তু, আলোচনার ক্ষেত্রগত সাদৃশ্যের কারণে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড ব্যবহার করে ভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে লোকসাহিত্যের বিশ্লেষণ সম্ভব। ফলে, পূর্বে উল্লিখিত লোকভাষাবিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞান এদের সূক্ষ্ম পার্থক্য দূর করে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের একটি অনুষঙ্গী শৃঙ্খলারূপেই বর্তমানে লোকভাষাবিজ্ঞানকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

উল্লিখিত এই তাত্ত্বিক বিবেচনাকে সামনে রেখে বলা যায় যে, চাকমা লোকসাহিত্যের উপাদানগুলোর বিশ্লেষণ মূলত লোকভাষাবিজ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত বিষয়। এ কারণেই লোকভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে চাকমা লোকসাহিত্যে বাংলা ভাষার প্রভাব পর্যবেক্ষণ করে এদের ভাষাবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য দেখানো হবে। এছাড়াও প্রাপ্ত শব্দগুলোর প্রতিবেশগত অর্থ, সংস্কৃতি বিচারে এদের ব্যবহার বিশ্লেষণও এ প্রবন্ধের লক্ষ্য। লোকসাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দগুলো লোকমানবের প্রতিনিধিত্ব করে কি-না লোকভাষাবিজ্ঞানের আলোকে তা যাচাই করাও এই প্রবন্ধের অন্যতম বিবেচনার বিষয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত উপাত্তসমূহ দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থে (দ্রষ্টব্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি) সংকলিত বিভিন্ন চাকমা ছড়া, গীতিকা, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতির ভাষাগত দিক উপাত্ত হিসেবে গ্রহণ করে তাদের ভাষাবৈজ্ঞানিক ও লোকভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪. লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্যের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করে পাশ্চাত্য সমালোচকেরা একে 'সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি, ব্যক্তিবিশেষের একক সৃষ্টি নহে' (ভট্টাচার্য; ২০০৪ : ১) বলে অভিহিত করেছেন। সাধারণভাবে বলা যায় যে, লোকসাহিত্য কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর

অলিখিত সাহিত্য। লোকসাহিত্যকে সংজ্ঞায়িত করে M.J Harskovits বলেছেন, 'জাতীয় সংস্কৃতির যে সকল সাহিত্যিক ও মননশীল সৃষ্টি মুখ্যত মৌখিক ধারা অনুসরণ করে অগ্রসর হতে যায়, তাই লোকসাহিত্য; যেমন গীতিকা, কথা, সঙ্গীত ইত্যাদি' (তথ্যসূত্রঃ ভট্টাচার্য; ২০০৪ : ১৮)। লোকসাহিত্য মুখে মুখে রচিত, প্রচারিত ও প্রচলিত হয়। ক্রম পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। জার্মান একটি প্রবাদ অনুসারে, লোকসাহিত্যের মাধ্যমেই কোনো জাতির অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ, একটি জাতির ঐতিহ্যের ধারক, বাহক ও পরিচায়ক লোকসাহিত্য। মনে করা হয়, যে জাতির লোকসাহিত্য যত সমৃদ্ধ সে জাতির সংস্কৃতি ততটাই উন্নত। বাংলাদেশেও সুদীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী লোকসাহিত্যের অগ্রযাত্রা রয়েছে অব্যাহত। বাংলা ভাষা ছাড়াও এদেশে অন্য ভাষা ব্যবহারকারী অনেক ভাষাগোষ্ঠী আছে, যেমন — চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাঁওতাল, খাসিয়া ইত্যাদি। এদের নিজস্ব ভাষা ও সাহিত্য রয়েছে। চাকমা জাতির প্রাচীন লোকসাহিত্য তাদের সভ্যতা সংস্কৃতির পরিচয় দেয়। জেলা গেজেটিয়ার্স-এ বলা হয়েছে, 'The chakmas have got no worth mentioning modern literature. But they are rich in respect of folk literature' (Ishaq, 1975 : 211)। চাকমা সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধশালী করেছে অজস্র প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা পুরাকাহিনী, ইতিকথা, উপকথা, বারমাসী, লোকগাথা, প্রেমসংগীত ও ভাবসংগীত। এ পর্যায়ে চাকমা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান অর্থাৎ, লোকছড়া, লোকগীতি, ধাঁধা ইত্যাদি উল্লেখ করে তাতে বাংলা শব্দের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হবে।

৪.১. লোকছড়া

লোকসাহিত্যের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছড়া। লোকবিদদের বিশ্বাস যে, ছড়া সমগ্রভাবে ব্যক্তি কিংবা সমাজের সচেতন মনের সৃষ্টি নয় বরং স্বপ্নদর্শী মনের অনায়াস সৃষ্টি। চাকমা ছড়া ছন্দোময় হয়, তবে সব ছড়া অর্থপূর্ণ হয় না; কিন্তু অর্থহীন হওয়া সত্ত্বেও ছড়াগুলো প্রাণবন্ত এবং আকর্ষণীয়। লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন এই ছড়াগুলো সুপ্রাচীনকাল থেকে চাকমা সাহিত্যে প্রচলিত আছে। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত *পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গেজেটিয়ার্স*-এ পাঁচটি চাকমা ছড়া ('ঘুমপাড়ানি' গান হিসেবে ব্যবহৃত) রোমান হরফে ইংরেজি অনুবাদসহ সংকলিত হয়েছে। এছাড়াও সুগত চাকমা, সতীশচন্দ্র ঘোষ এবং আরো কয়েকজন চাকমা ভাষা-গবেষক সংকলন করেছেন চাকমা ছড়া। সতীশ চন্দ্র ঘোষ *চাকমা জাতি* (১৯০৯) গ্রন্থে ঘুমপাড়ানি, বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা ও অর্থহীন — এ তিন ধরনের ছড়ার কথা বলেছেন। নিচে বিভিন্ন সংকলন থেকে প্রাপ্ত চাকমা ছড়া বাংলায় প্রতিবর্ণীকৃতরূপে উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করা হলো —

> সোনার ধুলনৎ রূবোর দরি
> ন হানিজ বাবুধন ঘুম যা ধুলনৎ ফরি।

এখানে শিশুকে না কেঁদে রূপার দড়ি বাঁধা সোনার দোলনায় ঘুমাতে বলা হচ্ছে।

> দারু তুলি জারুফল ন হানিজ বাবুধন
> রেঙ্গুন সরত্তুন ত বাবে আনি দিব নাড়িউল।

ঘুম থেকে উঠলে নারকেল দেবার লোভ দেখিয়ে শিশুকে বলা হচ্ছে ঘুমিয়ে যেতে।

এ হুলে কলাগাছ ঐ হুলে ছড়া
বাবুধন ঘুম যা ভাঙ্গিব গলা।

এ ছড়াটিও একটি ঘুমপাড়ানি ছড়া যেখানে শিশুকে বলা হচ্ছে কাঁদলে গলা ভেঙে যাবে, তাই না কেঁদে ঘুমিয়ে যেতে।

উনদুরে গত্তন কজমজ, বিলেই আঘে বই,
বুজ্যা বাবা ঘুম যায় সোনার ধুলনৎ লই।

ইঁদুর খচখচ শব্দ করছে, বিড়াল বসে আছে আর শিশুটি সোনার দোলনায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে।

বাবা বুজ্যা ন হানিজ তুই
বাঙালে কলা মলা আনতে লৈ দিম্বৈ মুই।

বাঙালি বিক্রেতারা কলা, মুড়ি নিয়ে এলে কিনে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে শিশুকে ঘুমপাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ছড়াগুলো মূলত ঘুম পাড়ানি গান হিসেবে ব্যবহৃত। উপরিউক্ত ছড়াগুলোতে প্রাপ্ত বাংলা শব্দগুলো নিম্নরূপ—

সোনা, দড়ি, বাবুধন, ঘুম, রেঙ্গুন (মায়ানমার), কলা, গাছ, কূলে, গলা, মুই।

প্রাপ্ত এই শব্দগুলো সম্পূর্ণরূপে বাংলা ভাষার শব্দের সাথে ধ্বনিগত ও অর্থগতভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। এছাড়াও যেসব শব্দ বাংলার সাথে অর্থগতভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ, কিন্তু ধ্বনিগতভাবে ভিন্ন সেগুলো নিম্নরূপ—

বাংলা শব্দ	চাকমা শব্দ	আ.ধ্ব.ব.
রূপা	রূবো	[ρυβo]
কাঁদিস	হানিজ	[ηανιζ]
আনি	আনি	[ανι]
নারিকেল	নাড়িউল	[να}ιυλ]
ভাঙ্গব	ভাঙিবো	[βΗαΝιβo]

সারণি ১ : চাকমা লোকছড়া থেকে প্রাপ্ত মান বাংলার সাথে ধ্বনিগতভাবে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ শব্দ

এছাড়াও চাকমা ভাষার নিজস্ব কিছু শব্দ আছে যেগুলোর অর্থ একই। সেগুলো নিম্নরূপ—

সরত্তুন [Σ□ρ□τ5τ55υν] — শহর থেকে	কজমজ [κ□|□μ□|□] — খচর মচর
উনদুর [υνδυρ] — ইঁদুর	বুয্যা [βυι||α] — বুড়া
গত্তন [γ□τ5τ□5ν] — করে	

সারণি ২ : চাকমা লোকছড়ায় ব্যবহৃত চাকমা ভাষার নিজস্ব শব্দ

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চাকমা ভাষার কিছু শব্দ চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যেমন : 'মুই', সরত্তুন (শহর থেকে)।

তাছাড়াও চাকমা শিশুরা খেলার সময় অর্থহীন কিছু ছড়া ব্যবহার করে, যেমন —

ইজিবিজি করমা বিজি
মইচ চরে ঘোড়া চরে
সাধু বইয়ে কদু রান
বর্গি উত্তন মনো রাম
এলগা দেলগা রাজা বাবু
কৈয়েদে চুর' আহত্তান কাবি নেজা।
[বাংলা গদ্যরূপ]

'ইজিবিজি' নামক একটি শিশুতোষ খেলাতে অর্থহীন কিন্তু আনন্দপূর্ণ এই ছড়াটি ব্যবহৃত হয়। এই ছড়াটিতে প্রাপ্ত বাংলা শব্দগুলো হলো — ঘোড়া, সাধু, রাজা। এছাড়াও নিম্নোক্ত বাংলা শব্দগুলো ধ্বনিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে একই অর্থসহ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

বাংলা শব্দ	চাকমা শব্দ	আ.ধ্ব.ব.
বীচি	বিজি	[βιζι]
চড়ে	চরে	[χ□ρε]
চোর	চুর	[χυρ]

সারণি ৩ : শিশুতোষ ছড়াতে ব্যবহৃত ধ্বনিগতভাবে পরিবর্তিত চাকমা শব্দ

উপর্যুক্ত চাকমা ছড়াগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা বাংলা ভাষার শব্দাবলির তিন ধরনের অন্তর্ভুক্তি লক্ষ করতে পারি :

- অর্থ ও ধ্বনিগতভাবে বাংলা ভাষার সাথে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ। এ ধরনের প্রাপ্ত শব্দগুলো সোনা, কলাগাছ ইত্যাদি।
- বাংলা ভাষার সাথে ধ্বনিগতভাবে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ কিন্তু অর্থগতভাবে এক, যেমন : বিড়াল > বিলেই, ইঁদুর > উনদুর ইত্যাদি।
- এছাড়াও বাংলার সাথে অর্থগতভাবে সাদৃশপূর্ণ চাকমা ভাষার নিজস্ব শব্দ, যেমন : সরোত্তুন, উনদুর ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, চাকমা লোকসমাজে প্রচলিত ছড়া খুব বেশি গৃহীত হয়নি। বিভিন্ন গ্রন্থে প্রাপ্ত ছড়াগুলোতে পুনরাবৃত্তি লক্ষণীয়।

৪.২. লোকগীতি

লোকগীতি বা লোকসংগীত হচ্ছে লোকসাহিত্যের মধুর অংশ। এর সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করলে বলা যায়, 'যাহা একটি মাত্র ভাব অবলম্বন করিয়া গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত ও লোকসমাজ কর্তৃক প্রচারিত হয়, তাহাই লোকগীতি' (ভট্টাচার্য; ২০০৪ : ২০৮)। চাকমা সমাজের ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীত 'উভা গীত'। সাধারণত তরুণ-তরুণীরা এই গান গেয়ে থাকে। স্পষ্টরূপে সংক্ষিপ্ত আকারে মরমী কাহিনী, বিরহ গাথা, সাধকের হৃদয়ের আবেগ এই উভা গীতের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। 'উভা গীতে প্রায়ই দুই চরণের অধিক থাকে না। তাহাতেও আবার প্রথম চরণটি

মাত্র পদমিলনের নিমিত্তে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই পূর্ব ও উত্তর চরণে অর্থগত সম্বন্ধ দেখা যায় না এবং 'উভা গীত' নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়াই বোধ হয়। গায়কেরা উপসংহারে সুদীর্ঘ 'কুই' (উ-উ-উ-উ) ধ্বনি দিয়া উহাকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করিয়া লয়' (ঘোষ; ১৯০৯ : ৩৭৯)। চাকমা ভাষা থেকে সংগৃহীত একটি উভা গীত —

সুবোরি কাবি কাবি হাঙ
উধে মনখুন নানা গান
ছরমা হুড়োড়ে কি হুদ দিম
উদাসী মনরে কি বুজ দিম
ছরমা হুড়ো ন খায় হুদ
উদাসী মনে ন পায় বুজ
দনা উজোনি জুনি গেল
পুরানি ভালেৎ দিন উধি গেল
মাম্বারা খেইয়া ছাগল্যা
দজ্যাৎ ভাজের পাগল্যা
[বাংলা গদ্যরূপ]

উদাসী মনের ভাব এই গীতে প্রকাশিত হয়েছে। দৈনন্দিন গৃহস্থালি কাজের বর্ণনা দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, কোনো কাজেই মন বসছে না। এতে প্রাপ্ত শব্দগুলোর অধিকাংশই চট্টগ্রামের ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই গীতটিতে ব্যবহৃত শব্দগুলোকে পূর্বের মতোই তিন ভাগে বৈশিষ্ট্যান্বিত করা যায়। প্রথমত, মান বাংলার সাথে ধ্বনিগত ও অর্থগতভাবে পূর্ণ সাদৃশ্যজ্ঞাপক শব্দ :

চাকমা শব্দ	আ.ধ্ব.ব.
সুবোরি	[Συβορι]
নানা গান	[νανα γαν]
উদাসী	[υδ5αΣι]
মন	[μον]

সারণি ৪ : চাকমা লোকগীতিতে ব্যবহৃত মান বাংলার সাথে অর্থগতভাবে পূর্ণ সাদৃশ্যজ্ঞাপক শব্দ

দ্বিতীয়ত, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ :

চাকমা শব্দ	আ.ধ্ব.ব.
মনখুন	[μονοτ5τ5Hυν]
হুড়ো	[ηυ)}ο]
হুদ	[ηυδ5]
বুজ	[βυζ]

সারণি ৫ : চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ চাকমা শব্দ

তৃতীয়ত, চাকমা ভাষার নিজস্ব কিছু শব্দ —

চাকমা শব্দ	**আ.ধ্ব.ব.**
কাবি	[καβι]
উধে	[υδ5Hε]
ছরমা	[σ□ρμα]
দনা	[δ5□να]
উজানি	[υζανι]
জুনি	[ζυνι]

চাকমা শব্দ	**আ.ধ্ব.ব.**
মাম্বারা	[μαμβαρα]
খেইয়া	[κHειψα]
ছাগল্যা	[σαγοιλλΘ]
দজ্যাং	[δ5□│Θτ5]
ভাজের	[βHαζερ]
পাগল্যা	[παγοιλλΘ]

সারণি ৬ ও ৭ : লোকগীতিতে ব্যবহৃত চাকমা ভাষার নিজস্ব কিছু শব্দ

প্রাপ্ত শব্দগুলো থেকে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো — চাকমা ভাষার নিজস্বতা থাকা সত্ত্বেও এটি নিঃসন্দেহে একটি মিশ্র ভাষা। মান বাংলা অথবা বাংলা ভাষার আঞ্চলিক রূপের ব্যবহার এ ভাষার শব্দভাণ্ডারে ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। এছাড়াও হিন্দি, উর্দুসহ আরও কিছু ভাষার শব্দের ব্যবহারও চাকমা ভাষায় লক্ষণীয় যেমন : লাজ [laζ], জাঙ্গাল [│αNγαλ], মদন [μ□δ5ον], গরিব [γοριβ] ইত্যাদি। চাকমা ভাষার বিখ্যাত গীতিকা 'চাদিগাঙ ছারাপালা' (চট্টগ্রাম শহর ছেড়ে যাওয়ার কাহিনী)। এতে উল্লিখিত আছে যে, চাকমা জাতি বহুযুগ আগে নেপালে বসবাস করত। পরবর্তীকালে বর্তমান মায়ানমার, আরাকান প্রদেশ হয়ে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করতে আসে। চাকমা লোকসাহিত্যে প্রাপ্ত বাংলা এবং অন্যান্য ভাষার শব্দ উক্ত মন্তব্যের প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হতে পারে। পূর্বে উল্লিখিত 'চাদিগাঙ ছারাপালা' ছাড়াও 'রাধা মোহন ধনপদি' চাকমা ভাষায় রচিত গুরুত্বপূর্ণ লোকগীতি। তবে আয়তনে দীর্ঘ বলে লোকসাহিত্যে এদের গীতিকা শ্রেণিভুক্ত করা হয়ে থাকে। লোকগীতি ও গীতিকার পার্থক্য কেবল আয়তনে। গীতিকা, লোকগীতি, লোকগাথা, পালা বা পালাগান প্রভৃতি নানা নামে প্রচলিত দীর্ঘগীতি চাকমা লোকসাহিত্যের আরেকটি নিদর্শন। ঘটনাকেন্দ্রিক দীর্ঘ আখ্যানসমৃদ্ধ এই পালাগানগুলো বেশ কিছু পর্বে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি পর্বের নিজস্ব নাম থাকে। চাকমা লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক চারণ কবি বা 'গেং উলীরা' মুখে মুখে এগুলো গেয়ে থাকেন। বেহালা, সারাঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে এতে তাল দেওয়া হয়। চাকমা ভাষার সংগৃহীত লোকগীতিকার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় পালাগান 'রাধা মোহন ধনপদি'-এর ২য় খণ্ড 'ফুলপারা' থেকে কিছু অংশ নিচে উপস্থাপন করা হলো —

বিন্যা চন্তন খোইয়া কুরা
উদা ধোজ্যন দ্যমুরা
এক কাপ উধি তিন কাপ যান
দ্বিকাপ উধি তিন কাপ যান
তিন কাপ উধি চেইর কাবত
চেইর কাব ফুরেই পাচ কাবত
জাদি পূজাত চোজ্যন্দে

পাচ কাব মাধাত্ত পোজন্দে
চগদায় কামাল্যা ঘেরে আন
ঝরঝরে পরের হেইয়া ঘাম ॥
[বাংলা গদ্যরূপ]

সাধংগিরি রাজার দৌহিত্র ধনপদি এবং চম্পকনগরের রাজার পুত্র রাধামোহন (রাধামন)-এর প্রেম ও বিবাহিত জীবনের বিরহ-গাথা নিয়ে রচিত এই পালাগানটি। এক পর্যায়ে রাধামোহন চট্টগ্রাম শহর (চাদিগাঙ) ছেড়ে যুদ্ধে যান, সেই সময়ের কিছু কাহিনী উল্লিখিত অংশে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাপ্ত শব্দগুলোর মধ্যে মান বাংলার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দগুলো হলো —

চাকমা শব্দ	আ.ধ্ব.ব.
এক	[Θκ]
কাপ	[καπ]
তিন	[τ5ιν]
ঝরঝরে	[φH□ρϑη□ρε]
পরে	[π□ρε]
ঘাম	[γHαμ]

সারণি ৮ : চাকমা লোকগীতিতে ব্যবহৃত মান বাংলার সাথে অর্থগতভাবে পূর্ণসাদৃশ্যজ্ঞাপক আরো কিছু শব্দ

লক্ষ করলে দেখা যায় যে, সংখ্যাবাচক যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তা সামান্য পরিবর্তন ছাড়া বাংলা ভাষার শব্দের মতোই। এছাড়াও ধ্বনিগত পরিবর্তনসহ যে বাংলা শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো —

বাংলা শব্দ	চাকমা শব্দ	আ.ধ্ব.ব.
চার	চেইর	[χε≈ιρ]
জাতি	জাদি	[|αδι]

সারণি ৯ : মান বাংলার সাথে অর্থগতভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ চাকমা সংখ্যা বাচক শব্দ

অবশিষ্ট শব্দগুলো চাকমা ভাষার নিজস্ব শব্দ যা চট্টগ্রামের উপভাষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। দীর্ঘ এসব পালাগান বা গীতিকা মূলত লোকমুখে প্রচলিত ভাষারূপ ব্যবহার করেই গড়ে উঠেছে।

৪.৩. বারমাসী

লোকসংগীতের উজ্জ্বল অংশ বারমাসী গান। বছরের বারো মাসের সুখ-দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষার কথার বর্ণনাই বারমাসীর বিষয়বস্তু। নারীর মনের কথা ব্যক্ত করা ছাড়াও প্রকৃতির বর্ণনাও এতে পাওয়া যায়। 'ঋতুশাসিত কৃষিভিত্তিক সমাজজীবনেও পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন একই সঙ্গে বাহ্যিক ও মানসিক। প্রকৃতির এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে

লোকসমাজের বিচিত্র মনোভাব অবলম্বন করে রচিত হয়েছে বারমাসী গান।' (অমলেন্দু; ১৯৮৪ : ৭)। চাকমা লোকসাহিত্যে বারমাসীকে 'বারমাচ' বা 'বারমাস' বলে। "বঙ্গীয় ললনাগণ বার মাসের উপর্যুপরি লাঞ্ছনায় ঝালাপালা হইয়া মনের উচ্ছ্বাসে বার মাস জুড়িয়া দিতেন। এই সকল হিন্দু অবলার বারমাসও চাকমা সমাজে যথেষ্ট আছে। সত্য, কিন্তু তাহাদের নিজস্বও কম নহে। 'কির্বাবির বারমাস' 'শেষ্যোয়া কন্যার বারমাস', অন্যাবির বারমাস, 'রঞ্জনমালার বারমাস', 'কালিন্দী রাণীর বারমাস', ইত্যাদি কতই আছে।" (ঘোষ, ১৯০৯ : ৩৪৬)। আর্যমিত্র চাকমা 'মা-বাব' নামক একটি বারমাসীর দুটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। এর বৈশাখ মাসের বর্ণনার কিছু অংশ নিম্নরূপ —

বৈশাখ মাসেতে মা-বাব অইল নিধন
সেবিতে ন দিলে বিধি মা-বাব চরণ।
ফুটিল মালতী ফুল গন্ধ অইল দূর
আমাদের ছাড়িনে মা-বাব গেল স্বর্গপুর।

এই বারমাসীর ভাষা বাংলার সাথে প্রায় অপরিবর্তিত রূপে সাদৃশ্যপূর্ণ। যার ফলে অর্থ অনুধাবন করা অনেকেটাই সহজ হয়ে যায়। এতে ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে চাকমা ভাষায় ব্যবহৃত নিজস্ব শব্দগুলো হলো —

শব্দ	আ.ধ্ব.ব.
বাব	[βαβ]
অইল	[□ιλο]
ছাড়িনে	[χHαρινε]

সারণি ১০ : চাকমা বারমাসী বিশ্লেষণে প্রাপ্ত চাকমা ভাষার নিজস্ব কিছু শব্দ

উক্ত শব্দগুলো ছাড়া বাকি শব্দগুলো বাংলার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে বাংলাভাষীদের কাছে পরিচিত। এছাড়াও চাকমা ভাষার ধর্মবিষয়ক লোকগীত ও কর্মসংগীতের (ভারী কাজ করার সময় উদ্দীপনা যোগায়) অস্তিত্বও পাওয়া যায়।

৪.৪. প্রবাদ-প্রবচন

মৌখিক সাহিত্যের একটি ধারা প্রবাদ-প্রবচন। চাকমা ভাষায় একে বলা হয় 'দাগ কধা' অর্থাৎ ডাক কথা, যা মুখে মুখে তৈরি ও প্রচারিত হয়। চাকমা লোকসাহিত্যে এসব প্রবাদ-প্রবচন তাদের ঐতিহ্যময় সাহিত্য চর্চার প্রমাণ দেয়। '...চাকমা দাগকধাগুলো খুবই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। অল্পকিছু দাগকধা বাংলা ভাষা থেকেও এসে গেছে। সেগুলো সহজে চেনা যাবে। নিখুঁত চাকমা দাগকধাগুলো পরিপূর্ণ চাকমা ভাবধারা মতে গঠিত' (দেওয়ান; ২০০৫)। এই উক্তিটি একদিকে যেমন চাকমা প্রবাদগুলোর প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দেয়, তেমনি চাকমা প্রবাদে বাংলা ভাষার অস্তিত্বও প্রমাণ করে। চাকমা লোকসাহিত্যের অন্য শাখাগুলোর তুলনায় প্রবাদ-প্রবচন সংগৃহীত হয়েছে বেশি। সতীশচন্দ্র ঘোষ, সুগত চাকমা, বঙ্কিমচন্দ্র চাকমা, জাফর আহমাদ হানাফীসহ বেশ ক'জন গবেষক সংকলন করেছেন চাকমা প্রবাদ।

বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি চাকমা প্রবাদ নিচে উল্লেখ করা হলো, যা থেকে এর ভাষারূপ সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যাবে —

ঝিয়ারে মারি বৌরে শিগায়

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো' প্রবাদটির সঙ্গে ভাষাগত ও অর্থগত দিক থেকে এটি সাদৃশ্যপূর্ণ। পরিবর্তিত রূপে মারা > মারি, বৌকে > বৌরে, শিখায় > শিগায়, ঝিকে > ঝিয়ারে ব্যবহৃত হয়েছে।

নেই মোগত্তুন কান মোগ ভালা
সবায় না পাধে রাজাঝি ভালা

মোগ — স্ত্রী, রাজাঝি — রাজার মেয়ে, অর্থাৎ কাজ না জানা অকর্মণ্য নারী। একেবারে স্ত্রী না থাকার চেয়ে কানা স্ত্রী থাকা ভালো। আর তাও যদি না থাকে তবে রাজার কন্যা বা অকর্মণ্য স্ত্রী থাকলেও চলবে। প্রাপ্ত শব্দগুলোতে কানা > কান, ভালো > ভালা, রাজা, ঝি এই শব্দগুলো বাংলা ভাষার অনুরূপ। এছাড়াও চাকমা ভাষায় প্রচলিত আরও প্রবাদ রয়েছে যার শব্দাবলি সম্পূর্ণ চাকমা ভাষার নিজস্ব এবং বাঙালি সমাজব্যবস্থার সাথে তাদের সমাজের যে সাদৃশ্য প্রচুর তা প্রমাণ করে। যেমন —

বাপ চা পুত চা, মা চা ঝি চা

অর্থাৎ, মা যেরকম মেয়ে সেরকম হবে, আর বাবার মতো হয় ছেলে। কিংবা 'সৎমায়ের কথা ভাবলে আত্মা উড়ে যেতে চায়' বোঝাতে :

সাদাঙা কলে আদাঙা উরে।

৪.৫. ধাঁধা

লোকসাহিত্যের একটি মজার অংশ ধাঁধা। চাকমা ভাষায় ধাঁধাকে বলা হয় 'বানাহ্'। একটিমাত্র ভাবপ্রকাশক ধাঁধাগুলো রূপকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। রূপক ভেদ করে এর রহস্য উন্মোচন করতে হয়। বিভিন্ন গবেষক কর্তৃক সংকলিত চাকমা ধাঁধার মধ্যে বঙ্কিমকৃষ্ণ দেওয়ানের *চাকমা প্রবাদ প্রবচন, বাগধারা ও ধাঁধা* গ্রন্থটিতে সর্বোচ্চ ৬৮টি ধাঁধা পাওয়া যায়। তবে ধারণা করা হয় যে, লোকসাহিত্যে সমৃদ্ধ একটি ভাষায় এর চাইতে অনেক বেশি ধাঁধা থাকবে। বিভিন্ন প্রাণী, ফল, গৃহস্থালির সামগ্রী, গাছপালা, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে চাকমা ধাঁধা রচিত হয়েছে। লক্ষ করে দেখা গেছে, অনেক চাকমা ধাঁধার সাথে বাংলা এমনকি অন্যান্য ভাষার ধাঁধার মিল রয়েছে। আবার একান্তভাবে নিজেদের জীবনধারা নিয়েও চাকমা ধাঁধা রয়েছে, অন্যান্য ভাষায় এর উদাহরণ পাওয়া যায় না। এরকম কয়েকটি ধাঁধা নিম্নরূপ —

(ক) জেদা লক্কে এক, মলেহ্ দুই।
অর্থ : ঝিনুক (মরে গেলে দু' টুকরো আর জীবিত অবস্থায় এক)
(খ) আট হাত ষোল আঁদু, মাচমারা যিয়ে সাধু
চুগুনো খালৎ ফেল্যুং জাল, মাচ মারতে পরান যার।
অর্থ : মাকড়সা।

(গ) মা কান্দে পুয়া দাঙর আয়।
অর্থ : চরকা (চরকায় ঘ্যানর ঘ্যানর শব্দে সুতা তৈরি হয়)।
(ঘ) কেদি ঝারত বাঘ যায়।
অর্থ : উঁকুন (ছোট বনে বাঘ থাকে)

এছাড়াও ফল, ফুল, উদ্ভিদ, গাছপালা ও প্রকৃতি বিষয়ে চাকমা বানাহ্ আছে।

(ঙ) হিলত বিলত পানি নেই
ঘাজ আঘাত কুয়া।
অর্থ : নারকেল (পাহাড় বিলে পানি নেই, আছে গাছের মাথায়)।
(চ) আগা আঘে ঘরা নেই
ধেলা আঘে পাদা নেই।
অর্থ : স্বর্ণলতা (আগে আছে গোড়া নেই, ডাল আছে পাতা নেই)।
(ছ) চালর উওরে শিয়ান ছা
কিজাক কিজাক করে রা।
অর্থ : মেঘগর্জন (চালের উপর শিয়াল ছানা কেমন যেন শব্দ করে)।

ওপরে উদ্ধৃত ধাঁধাগুলো লক্ষ করলে দেখা যায়, সংখ্যাবাচক শব্দগুলো (যেমন — এক, দুই, ষোল) মান বাংলার সাথে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ। চাকমা ভাষার নিজস্ব সংখ্যাবাচক শব্দ থাকা সত্ত্বেও লোকসাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে বাংলা শব্দ। বিশেষ্য শ্রেণির হাত, মা, বাঘ, কুয়া, পানি, এই শব্দগুলোও বাংলা শব্দ। এছাড়াও চাকমা ভাষার নিজস্ব শব্দের উপস্থিতি লক্ষণীয়।

৫. চাকমা লোকসাহিত্যের লোকভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

চাকমা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ ছড়া, গীত, বারমাসী, প্রবাদ, ধাঁধাতে ব্যবহৃত শব্দগুলো লক্ষ করলে দেখা যায় যে, চাকমা ভাষার নিজস্ব শব্দ ছাড়াও এখানে অন্যান্য ভাষার শব্দ রয়েছে। মূলত বাংলা, হিন্দি, আরবি, ফারসি, অহমিয়া, সংস্কৃত পর্তুগিজসহ অন্যান্য আদিবাসী ভাষার শব্দ স্থান পেয়েছে চাকমা ভাষায়। অশোক কুমার দেওয়ান (১৯৯৬) চাকমা শব্দের তালিকা সংগ্রহ করে তাদের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি উল্লেখ করে একটি শব্দকোষ প্রণয়ন করেন। এতে চাকমা ভাষায় যে বিভিন্ন ভাষার শব্দের সংমিশ্রণ আছে তার উদাহরণ পাওয়া যায়, যেমন — কারবারী (ফারসি 'কারবার') = গ্রামের মোড়ল/দলপতি, 'ঘায়েল'(হিন্দি) = বিপর্যস্ত/আঘাতপ্রাপ্ত, যের (ফারসি) = শেষ/পশ্চাৎ (দেওয়ান; ১৯৯৬)। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চাকমা ভাষায় সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছে বাংলা শব্দ। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষা ছাড়াও তাদের সাহিত্যেও বাংলা ভাষার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ফলে, লোকসমাজে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন, লোকগাথা, ধাঁধা, ছড়া সবকিছুতেই বাংলা শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু চাকমা লোকসাহিত্যে বাংলা শব্দের প্রভাবের লোকভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা সেহেতু সংশ্লিষ্ট সূত্রে প্রাপ্ত শব্দগুলোকে শ্রেণিবিন্যস্ত করে এর রূপগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের পাশাপাশি ধ্বনিগত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনও দেখানো যেতে পারে। এছাড়াও বাংলা ভাষার শব্দ গ্রহণের পেছনে যে সমাজ-সংস্কৃতিগত কার্যকারণ রয়েছে তা থেকেও চাকমা ভাষায় বাংলা

শব্দের প্রয়োগ সংক্রান্ত বিশ্লেষণ করা যায়। ওপরে ব্যবহৃত চাকমা লোকসাহিত্যের উদাহরণগুলোতে ব্যবহৃত বাংলা শব্দগুলো নিচে বিশ্লেষণ করা হলো :

৫.১. ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন

লোকসাহিত্যের নিদর্শন থেকে দেখা যায়, অধিকাংশ বাংলা শব্দ ধ্বনিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চাকমা ভাষায় অনুপ্রবেশ করেছে। এ জাতীয় কিছু শব্দ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন : বীচি > বিজি, চোর > চুর, সুপারি > সুবোরি ইত্যাদি। এ জাতীয় শব্দগুলো পর্যালোচনা করে চাকমা ভাষার নিম্নোক্ত ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায় —

- ‘প’ [π] ধ্বনিটি শব্দের মধ্য বা অন্ত্য অবস্থানে পরিবর্তিত হয়ে ‘ব’ [β] হয়। যেমন : রূপা > রূবো [ρυπα > ρυβο], সুপারি > সুবোরি [Συπαρι > Συβορι], বাপ > বাব [βαπ > βαβ]।
- শব্দের আদ্য অবস্থানে ‘ক’ [κ] বা ‘খ’ [κH] ধ্বনিটি প্রায়শই ‘হ’ [η] ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন : কূল > হূল [κυλ > ηυλ], কাঁদিস > হানিজ [κα)δ5ιΣ > ηανιζ], খুদ > হুদ [κHυδ5 > ηυδ5]।
- শব্দের অন্ত্য অবস্থানে ‘অ’ [□] ধ্বনিটি প্রতিবেশ নির্বিশেষে ‘অ্যা’ [Θ] হয়ে যায়। যেমন : পাগল > পাগল্যা [παγολ > παγοιλλΘ], ছাগল > ছাগল্যা [χHαγολ > σαγοιλλΘ]।
- শব্দের মধ্য বা অন্ত্য অবস্থানে তাড়িত ড় [}] , ঢ় [}H] ধ্বনি প্রায়শই ‘র’ [ρ] ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন : দড়ি > দরি [δ5ο}ι δ5ορι], বাড়ি > বারি [βα}ι > βαρι]। ক্ষেত্রবিশেষে ‘র’ [ρ] ধ্বনিটি ‘ড়’ [}] রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন : কুরা > হুড়ো [κυρα > ηυ}ο]।
- ব্যঞ্জনধ্বনি সংশ্লিষ্ট আদ্য ‘ও’ [ο] পরিবর্তিত রূপে ‘উ’ [υ] বা ‘অ’ [□] হয়ে যায়। যেমন : ঘোড়া > ঘড়া [γHο}α > γH□}α], চোর > চুর [χηορ > χHυρ]।

উল্লেখ্য যে, বাংলা শব্দের ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে চাকমা সাহিত্যে ব্যবহৃত হলেও তাদের অর্থ অবিকৃত রয়েছে।

৫.২. রূপতাত্ত্বিক পরিবর্তন

চাকমা লোকসাহিত্যে ব্যবহৃত বাংলা শব্দগুলো বিশ্লেষণ করলে কিছু রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় —

- সর্বনামে প্রথম পুরুষে (first person) মুই, মরা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। যেমন : ‘বাঙালে কলা মলা আনতে লৈ দিয়্যে মুই’।
- সর্বনামে দ্বিতীয় পুরুষে (second person) তুই, তর, ত প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। যেমন : ‘রেঙ্গুন সরত্তুন ত বাবে আনি দিব নাড়িউল’।

- ক্রিয়া নিষেধাত্মক 'না' এর স্থলে 'ন' ব্যবহৃত হয় — ন হানিজ [কাঁদিস না], ন পাধে [না পেলে] ।
- দ্বিতীয়া বিভক্তি 'রে'-এর ব্যবহার পাওয়া যায় — ঝিয়ারে [ঝিকে], কুরারে [মুরগিকে] ইত্যাদি ।
- 'থেকে' বোঝাতে 'থুন' ব্যবহৃত হয় এবং 'থ' দ্বিত্বরূপে উচ্চারিত হয় — 'মনথুন' [মন থেকে], 'সরোত্থুন' [শহর থেকে] ইত্যাদি ।
- বদ্ধ রূপমূল 'ঈ' যোগে চাকমা ভাষায় বিভিন্ন ভাষার শব্দাবলি অনুপ্রবেশ করেছে। 'কারবার' (ফারসি)-এর সাথে 'ঈ' প্রত্যয় যোগে কারবারী হয়েছে। যার অর্থ গ্রামের মোড়ল/দলপতি ।

৬. চাকমা লোকসাহিত্য : লোক-সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপট

লোকসাহিত্যের নির্মাতা এবং বাহক 'লোকমানব' বা সাধারণ জনগোষ্ঠী। এই সাধারণ মানুষগুলোর প্রতিনিধিত্ব করতে হলে সাহিত্যের মাঝে লোকসমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিফলন থাকতে হবে। চাকমা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ধারা (ছড়া, ধাঁধা, গীত ইত্যাদি) থেকে যেসব বাংলা শব্দ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, লক্ষ করে দেখা গেছে, সামাজিক রীতি-নীতি, অনুষ্ঠান, সামাজিক জীবনযাত্রা, জীবিকার রকমফের ইত্যাদি সংস্কৃতির উপাদানগুলো নির্ভর করেই সেগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় — চাকমা ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ঘুম পাড়ানো ছড়াতে শিশুকে বিভিন্ন আকর্ষণীয় উপাদান (সোনা, রুপা) এবং বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী এনে দেবার কথা বলা হয়। যেমন —

দারু তুলি জারিফুল ন হানিজ বাবুধন
রেঙ্গুন সরত্তুন ত বাবে আনি দিব নারেউল।

এখানে দেখা যাচ্ছে, রেঙ্গুন অর্থাৎ বর্তমান মায়ানমার থেকে 'বাবা নারকেল এনে দেবে' — এই কথাটি ব্যবহার করে শিশুকে ঘুমের প্রতি আকৃষ্ট করা হচ্ছে। এ থেকে বোঝা যায়, পাবর্ত্য অঞ্চলে বসবাসরত এই জাতিসত্তার কাছে নারকেল একটি দুর্লভ ফল যা সেখানে ফলে না বলে সচরাচর খাওয়া হয় না। কিন্তু, মিষ্টতার কারণে শিশুদের কাছে প্রিয়। ফলে অন্য জায়গা থেকে এনে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। অপরদিকে, বাবা রেঙ্গুন শহর থেকে এনে দেবে এই কথাটি থেকে বোঝা যায়, পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালিদের সাথে সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত এই জাতিসত্তাটির মানুষদের নিজেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্য কোথাও গিয়ে কাজ করতে হয়। এছাড়াও একটি ছড়াতে দেখা গেছে শিশুকে বলা হচ্ছে — 'বাবা বুজ্যা ন হানিজ তুই, বাঙালে কলা মলা আনলে লৈ দিম্বৈ মুই' — অর্থাৎ, বাঙালি বিক্রেতা কলা এবং আনুষঙ্গিক খাবার (বিশেষত মুড়ি) নিয়ে এলে কিনে দেওয়া হবে এই অঙ্গীকার করে শিশুকে ঘুমাতে বলা হচ্ছে। এই ছড়াটি থেকে চাকমা জাতির খাদ্যের জন্য নির্ভরশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। উপরিউক্ত ছড়াগুলো হয়ত সামান্য ঘুম-পাড়ানো ছড়া কিন্তু, চাকমা জাতির জীবনের কাঠিন্য, খাদ্যের অপ্রতুলতা এখানে ফুটে উঠেছে।

আবার, চাকমা বারমাসী গীতগুলোতে বিরহ ব্যথা ফোটাতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, উদাসী ব্যক্তি তার গৃহপালিত মুরগি, ছাগল ইত্যাদিকে খাবার দিতে ভুলে যায়। এ থেকে বোঝা যায়, তারা গবাদি পশু পালন করত। এ থেকে তাদের পেশা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। চাকমা লোকসাহিত্যে ব্যবহৃত অধিকাংশ ধাঁধার উত্তর বিভিন্ন সবজি অথবা ফল। যেমন —

চিগোন বুর্জ্যা, দারিহ ফোর ফোজ্যা
ছোট বুড়া, দারিহ ফরফরা।
[বাংলা গদ্যরূপ]

অর্থ : ভুট্টা। এখানে কচি ও পরিপক্ব ভুট্টার বৈশিষ্ট্য ধাঁধার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। একইভাবে কাঁঠাল, পেঁপেগাছ, মিষ্টিকুমড়া, বিভিন্ন মাছ ইত্যাদি তাদের ধাঁধার উপজীব্য বিষয়। এছাড়াও চাকমা সংস্কৃতির যে আকর্ষণীয় দিকটি তাদের ধাঁধার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে তা হলো, চাকমা জনগোষ্ঠী শ্রমজীবী এবং কঠিন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হলেও তারা ভাবুক এবং প্রকৃতিপ্রেমিক। প্রকৃতিবিষয়ক বিভিন্ন ধাঁধা তাদের চারিত্রিক এই বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছে। যেমন :

কালা পোরোদ মালা ভাসে
(কালো পুকুরের মালা ভাসে)
অর্থ : চাঁদ

উড়ি উড়ি যায়, ধরি ন' পায়
(উড়ে উড়ে যায়, ধরা যায় না)
অর্থ : বাতাস ।

৭. চাকমা লোকসাহিত্যে ব্যবহৃত বাংলা শব্দ : সাংস্কৃতিক পারস্পরিকতা

প্রসঙ্গ বিবেচনায় প্রশ্ন জাগতে পারে যে, চাকমা লোকসাহিত্যে ব্যবহৃত বাংলা শব্দগুলো সংস্কৃতি ভেদে ভিন্নার্থক কি না। ওপরের বিভিন্ন ভাষাবৈজ্ঞানিক ও লোকভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণগুলো লক্ষ করলে দেখা যায় যে, বাংলা শব্দগুলো চাকমা ভাষায় ক্ষেত্রবিশেষে ধ্বনিগত বা রূপতাত্ত্বিক পরিবর্তনের মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে, কিন্তু অর্থগত ভিন্নতা বহন করে না। অর্থগত ভিন্নতা না থাকার কারণ সংস্কৃতিগত দিক দিয়ে বাঙালি সমাজ ও চাকমা সমাজ সাদৃশ্য বহন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'ঝিয়ারে মারি বৌরে শিগায়' বা 'নেই মোগত্তুন কানা মোগ ভালা' — এই প্রবাদগুলো বাঙালি সমাজেও একই অর্থ বহন করছে। অর্থাৎ বলা যায় যে, ব্যবহৃত বাংলা শব্দগুলো চাকমা লোকসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, তাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অর্থের ভিন্নতা আনেনি। আবদুস সাত্তার তাঁর *আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য* গ্রন্থটিতে আদিবাসী সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে একজন অজ্ঞাতনামা লোককবির দুটি চরণ উদ্ধৃত করেছেন —

নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত। [সাত্তার, ১৯৭৮ : ৩৪৪]

এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন যে, আদিবাসী ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ ইত্যাদির মূল বক্তব্য সব ভাষায় এক, কিন্তু পার্থক্য রয়েছে কেবল ভাষার ব্যবহারে।

৮. উপসংহার

কোনো জাতির লোকসাহিত্য সে জাতির সংস্কৃতির অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। চাকমা লোকসাহিত্য একদিকে যেমন চাকমা ভাষা ও ভাষা ব্যবহারকারীদের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের প্রমাণ দেয়, তেমনি লোকভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের এক অনন্য উপকরণও বটে। এই প্রবন্ধে চাকমা লোকসাহিত্যের উপাদানসমূহ লোকভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। দেখা গেছে যে, চাকমা লোকসাহিত্যে ব্যাপকভাবে বাংলা শব্দের উপস্থিতি রয়েছে। ধ্বনিগত ও রূপগত পরির্তনের মাধ্যমে অনেক বাংলা শব্দ চাকমা ভাষায় ঠাঁই করে নিয়েছে, যেগুলো বাংলা ভাষার সাথে সমার্থক। এছাড়াও হুবহু বাংলার অনুরূপ শব্দও চাকমা লোকসাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যায়। তাছাড়া চাকমা ভাষার নিজস্ব শব্দাবলিও রয়েছে, যার কিছু অংশ চট্টগ্রামের উপভাষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। চাকমা লোকসাহিত্যে বাংলা শব্দের অনস্বীকার্য প্রভাব এবং তার লোকভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এ প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে। পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজ, রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির প্রভাবে ও প্রতিক্রিয়ায় চাকমা লোকমুখে ব্যবহৃত ভাষা যদিও মিশ্র রূপ ধারণ করেছে, তবু তাদের সাহিত্যচর্চা থেমে থাকেনি। চাকমা ভাষার সমৃদ্ধ লোকসাহিত্য তাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে সক্ষম। ঐতিহ্যপূর্ণ এই লোকসাহিত্য নিঃসন্দেহে আরও বিস্তীর্ণ পরিসরে লোকভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের বিষয় হিসেবে পর্যালোচনার দাবিদার।

টীকা

১. ১৯৯১ সালের জনশুমারি অনুযায়ী, প্রায় ২,৫২,৯৮৬ জন চাকমা রয়েছে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান পার্বত্য অঞ্চলে। এছাড়াও ত্রিপুরা, মিয়ানমার, আসাম এবং অরুণাচল প্রদেশে প্রায় ১,৫০,০০০ চাকমা জনগোষ্ঠী বসবাস করছে।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

অশোককুমার দেওয়ান। ১৯৯৬। *চাকমা ভাষার শব্দকোষ*; উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙামাটি।
আবদুস সাত্তার। ১৯৭৫। *আরণ্য জনপদে*; ঢাকা।
আবদুস সাত্তার। ১৯৭৮। *আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য*; বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
ওয়াকিল আহমদ। ১৯৯৫। *বাংলা লোকসাহিত্য : ধাঁধা*; বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নন্দলাল শর্মা। ২০০৯। *চাকমা লোকসাহিত্য;* সূচীপত্র। ঢাকা
পবিত্র সরকার। ১৯৯১। *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি*; চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা।
মুহম্মদ আবদুল জলিল। ১৯৯৩। *লোকসাহিত্যের নানা দিক* ; বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ১৯৯৩। *বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান* ; বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান। ২০০৭। "লোকভাষা ও লোকসাহিত্যের ভাষা : ভাষাবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ " (পৃ. ৩৪১-৩৫২), *কলা অনুষদ পত্রিকা* (১ম সংখ্যা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
হাফিজ রশিদ খান। ২০০৫। *নির্বাচিত আদিবাসী গদ্য* ; অ্যাডর্ন পাবলিকেশন। চট্টগ্রাম।
Chakma. Retrived 21 February 2011. www.ethnologue.com
Grierson, G. A. 1927. *Linguistic Survey of India* (vol.1, part-1). Motilal Banarasi Das; New Delhi.
Mohammad Ishaq. 1975. *Bangladesh District Gazetteers Chittagong Hill Tracts.* (Ed.); Dacca